অসিতা মৈত্র (ভারতী) বি, এ কর্তৃক
৪৮, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭
হইতে প্রকাশিত।
কার্তিক—১৩৬৭

পপুলার আর্ট প্রিন্টার্স, ১, মুক্তারাম বাবু সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-৭

উৎসর্গ :—

যাঁরা কবিতা ভালোবাসেন—

এই সংকলনের কয়েকটি কবিতা সেকালের এবং কয়েকটি একালের, অর্থাৎ ইং বিংশ শতাব্দীর বিগত তিনটি দশকের বিচ্ছিন্ন সময়ের মধ্যে এ কবিতাগুলির জন্মকাল—সেটা মনস্বী কাব্যামোদীর দৃষ্টি এড়াবে না। চল্লিশ বা পঞ্চাশ দশকের কবিতা—যাদের পোষাকে আধুনিক ছাঁদের ছাঁট-কাটের বালাই-ই নেই, ষাট দশকের আধুনিক কাব্য পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে পেশ করবার কোনো অর্থ আছে কি? — এ প্রশ্ন যাঁরা আমার সামনে রাখবেন, তাঁদের আমি সবিনয়ে জানাবো যে, আমি কোনোদিনই কবিতার আধুনিক রচয়িতা ও আধুনিক পাঠকের গোষ্ঠীবন্ধনে বিশ্বাসী নই। কবিতার অনুপ্রেরণা ও অনুসরণ-অনুভাবনা কখনোই পঞ্জিকার নির্ঘণ্ট মেনে চলে না—কার্তিক মাসে বার্তাকু ভক্ষণ নিষিদ্ধ, এ অনুশাসন মানে না। সেকালের কবিতা একালের কাব্যামোদীর ভাল-লাগা, না-লাগা, কালের হুকুমজারির অপেক্ষা করে না। কাজেই, ইংরেজ কবি চসার্ বা ডান্ কিংবা বাঙালী কবি ভারতচন্দ্র বা বিহারী লালের কবিতা একালে কারোই ভাল লাগবে না, এ রকম অনুমানের কোনো কারণ নেই। বিভিন্ন কালে কবিতার পরিমার্জনে বহিরঙ্গের চাকচিক্যের ইতর বিশেষ চোখে পড়লেও, প্রচ্ছদের অন্তরালে কবিতার সৃষ্টি-মূলটি সেই একই রয়েছে-সেই মূলের রসে সঞ্জীবিত হয়েই কাব্য-ভাবনার ডাল-পালা বিস্তৃত কালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ কোনো ডালের পত্র-পুষ্পের সজ্জা-বৈচিত্র্যে কেউ যদি কিছু বেশী উৎসুক হন, তাঁকে নিবারণ করবার একমাত্র কারণ যে কবিতার পাণ্ডুলিপির ধূসরত্ব, এ মানতে আমার মন কোনোদিনই রাজী নয়। হয়তো কারো কাব্য-উৎসুক মন 'বার্লিন ওয়াল' ডিঙতে পারে, এই আশায় বর্তমান বহুরূপী গ্রন্থনাটি পেশ করলাম। আর সবচেয়ে বড় কথা, কবিতাগুলি 'আমার লেখা'—সেখানে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হওয়া যে-কোনো লেখকের পক্ষেই কঠিন।

ইতি—

কবিতা তোমাকে তবু খুঁজি

আমি শুধু তোমাকেই খুঁজি
মনে মনে, ভাবনার বনে বনে বুঝি।
ছুটির কামনা-চোখে, রাত-জাগা কাজে
জনতার ভিড় ঠেলে কলরোল মাঝে,
ঊষর শ্রমিক-পথে, ধুলি ধুম জালে,
যন্ত্রের জ্বালা-চোখে সকালে বিকালে,—
নিশিদিন কত খুঁজি আতি পাতি করে
বাসাহারা পারাবত জল চোখে ভরে।
তোমাকেই খুঁজি শুধু তারকার চোখে
চুমকি-ছড়ানো পথে মুক্তা আলোকে;
ঝিম-ধরা ঘনরাতে স্বপ্নের ফাঁকে
অথৈ ঘুমের নীলে খুঁজি যে তোমাকে।
কাজল মেঘের ঢেউয়ে, ব্যাকুল পাখায়
আঁধির আকুল বনে বাদামী পাতায়
খুঁজে ফিরি ভাবনার ধূ ধূ বালুচরে
অগণন পাতা ভরে কালির আখরে॥

দেখেছি অনেক আমি তবু—

দূরের কল্লোলে পেতে কান
তীরে বসে কত জাল বুনি—
সময়ের বিচিত্র নিরিখে—
অজস্র উদ্দাম ঢেউ গণি ;

মীনের বৈভব ভরা চোখে
অমেয় কী সমুদ্র সঙ্কেতে
নিপুণ কারুর ছোঁয়া দিয়ে
জাল বুনি কঠিন সৈকতে .

লবণ আস্বাদে বুক ভরে,
অনেক ডুবুরি, মাঝি, জেলে,
খুঁজেছে উদগ্র কোন্ চোখে
অগণ্য জটিল জাল ফেলে ;

দেখেছি অনেক আমি তবু
সুদীর্ঘ জটিল জাল টানি,
কী কঠিন রহস্য ইঙ্গিতে—
যদিও ছিঁড়বে সেতো জানি ঃ

এ-চোখে লবণ জ্বালা নিয়ে
অনেক ঢেউয়েই চোখ রাখি,
ছিঁড়েছে অনেক জাল, তবু
নতুন জালের আশে থাকি ॥

পলাতক

জীবন-যুদ্ধে আজ পরাস্ত আমি
ছেড়ে দিয়ে ঘাঁটি তাইতো এসেছি নামি,—
তূণীরে অস্ত্র শেষ, যুদ্ধের আবাহন
মিথ্যে শোনাও, বিজয়ে নেইকো মন।
ভাঙ্গা বেয়নেট, আর্দ্র বারুদ স্তূপে
আকীর্ণ পথে, সতর্কে চুপে চুপে
পলাতক দলে আমিও লেখানু নাম
যদিও জেনেই, রইলো না কোন দাম।
জয় গৌরব অন্যের তাও জেনে,
ভীরু আর মূঢ় আখ্যান নিই মেনে।
বেয়নেট হাতে অনেক দিয়েছি হানা,
লুটের অঙ্ক সেও তো হয়েছে জানা—
গোটা যুদ্ধের, এবার বিদায় দাও,
হে সেনা নায়ক, অস্ত্র ফিরায়ে নাও।
জেনেছি যুদ্ধ, চিনেছি অস্ত্র আরো,
শ্রান্ত এ মনে বয়েছি যুদ্ধ ভারও,—
পলাতক আমি হৃদয়ের সঙ্কেতে,
ঘৃণাই নিলাম লজ্জিত হাত পেতে।
ভুলবেনা মন জয়ের মন্ত্রণায়
আমি যে মুক্ত পরম নিঃস্বতায়॥

বেতালসিদ্ধ

বেঁচে আছি সেতো স্বতঃসিদ্ধ
কাঁধে গাণ্ডীব শিকারে দৃষ্টি
স্থির নিবদ্ধ।

গোটা পৃথিবীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ
শায়কে আমার বিঁধে বিঁধে সবই
দীর্ণ-ধ্বস্ত।

তূণীরে এখনো অনেক যন্ত্র
বিবিধ আয়াসে অধীত বিদ্যা-
শিকার তন্ত্র,—

'বাঁচাও বাঁচাও'—বিঁধেছে বক্ষ
সূচীমুখ তীরে শত্রু-শিকারী
দুর্নিরীক্ষ্য।

—জেনেছে কি তীর আমার স্পষ্ট
আমারি মতন হৃদয়-মাংসে
অভিনিবিষ্ট?

'বাঁচাও বাঁচাও শিকার বৃদ্ধ',
কার্যকারণে অতএব আমি
বেতাল সিদ্ধ॥

আকাশের সিঁড়ি

হয়তো বা কোনোদিন আজকের বিশিষ্ট তোমরা
সুযুক্তির সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠে গেছ একেবারে
উর্দ্ধতলে, ঐহিকের সুবর্ণ মহলে; তখন আমরা—
তোমাদের গূঢ়যুক্তি, মৎস্য-ন্যায় বুঝিল না যারা—
প্রত্যহের সমতলে ব্যবস্থিত গরিষ্ঠের নিরাকাঙ্খ ভিড়ে
আকাশের সিঁড়ি ভেবে অভিপন্ন বোধের তিমিরে।
তোমাদের তন্ত্রবোধে অবিবেক রয়ে গেল যারা,
মন্ত্রশুদ্ধ হইল না, অগত্যাই দণ্ডীমাপে
নৈমিত্তিক ধূসর ধূলায়, তাহাদের চোখের সমুখে
সুযুক্তির স্বর্ণ সিঁড়ি কিংবা আরো
সুজটিল প্রযোজনা রেখে, বিড়ম্বিত, করও না
তাহাদের সহজ বিবেক। তাহাদের মুক্তি দিও
নানাবিধ প্রাসঙ্গিক পরামর্শ হতে, অনর্থক বুঝে,
যেহেতু ইহারা সব পৃথিবীর সমতলে সমর্পিত প্রাণ॥

তপনিষ্ঠ

তোমাদের যুক্তিনিষ্ঠ অবহিত মন
পৃথিবীর সব দৃশ্যে করেছে রোপণ
জিজ্ঞাসার বীজগুলি। কোনোদিন
নিরুত্তর ভ্রূণগুলি হবেই প্রবীন
বিজ্ঞতার চতুর্বর্গে বিশিষ্ট সুফলে—
কার্যতই তপনিষ্ঠ গূঢ় কৌতূহলে।
পৃথিবী জেনেও তবু অনাশ্বস্ত মন
ভূগর্ভে হৃদয় খোঁজে, প্রাণের স্পন্দন
মহাপৃথিবীর বুকে আছে কিংবা নেই,
খুঁজে ফেরে সন্ধিৎসার ব্যস্ত হৃদয়েই।
বস্তুতই শশব্যস্ত গভীর প্রজ্ঞায়
সৃষ্টি স্থিতি, লয় তত্ত্ব নীতি অন্বেষায়।
অথচ আশ্চর্য এক নিরাসক্ত বোধ
স্পষ্টতই অনীহায় করে প্রতিরোধ
সহজ মানব রীতি, প্রেম ভালোবাসা,
মমতার করুণার সামান্য প্রত্যাশা।
অথচ সহজ সত্য জানে না নিশ্চয়
কেন কাঁদে পৃথিবীর পীড়িত হৃদয়;
বুকের গভীরে কোথা বিষকীট যত
নিরন্তর কুরে কুরে করিতেছে ক্ষত;
কীটদষ্ট কোন স্তরে ধরেছে পচন,—
জানিল না তোমাদের বিজ্ঞতম মন॥

বীতশোক

দৃষ্টি আর দিওনাকো আমাদের প্রতি,
সুনিশ্চয় লজ্জা পাবে, কেন না সম্প্রতি
আমরা নিরাবরণ, ছেড়েছি নির্মোক—
একান্তই ইচ্ছাসূত্রে স্পষ্ট বীতশোক।
দু-চোখে প্রচ্ছদ নেই, হৃদয়ের গূঢ় আচ্ছাদন
ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে দিয়ে উলঙ্গ এখন।
স্নেহ, প্রেম, মমতার আস্তরণ যত
মিথ্যাবোধে পরিত্যক্ত, ফলতঃ বিক্ষত।
আমাদের বাতায়নে আর চোখ পেতে
নতুন কোনোই সাজ পাবে না দেখিতে,
একাধিক অসংবৃত অশ্লীল শরীর
পৃথিবীর অন্ধ-ঘরে করিতেছে ভিড়।
সুনিশ্চয় লজ্জা পাবে সম্ভ্রান্ত বিবেকে,
ও-চোখ ফিরায়ে নাও আমাদের থেকে॥

নৈর্ব্যক্তিক

স্পষ্টতই বুঝেছি সবাই
আপাততঃ আর কিছু নাই
আমাদের গূঢ় অনুভবে,
নিমজ্জিত আকণ্ঠ উৎসবে—
কোপজ ব্যসনে নৈর্ব্যক্তিক
স্থিতবোধে গতানুগতিক।
লজ্জা, ঘৃণা, মান, অপমান
তুল্য মূল্য, সর্বথা সমান।
প্রাক্তনের আদি উপদেশ
কালক্রমে অধুনা নি শেষ
কার্য কারণের ফাঁস বেঁধে
ইচ্ছামৃত্যু লইয়াছে সেধে।
তবুও কয়েক মুষ্টি লোক—
অর্বাচীন, অহেতুক শোক
দুঃখে নিতান্ত কাতর,
যদিও জেনেছে পাথর
হয়ে গেছে বিদ্যাসাগরের চোখ।

সেই চোখে বিস্ময়ের বোধ
ভ্রূকুটি বা গাঢ় উপরোধ
নির্বিকল্পে অত্য সমাহিত,
কার্যসূত্রে বহু বিজ্ঞাপিত।
তথাপি কী আত্মশুদ্ধি জ্ঞান—
দৃশ্যতই শীলনে মহান—
স্বাধিষ্ঠিত নিরস্ত পাদপ,
নিঃস্ব মন্ত্র করি.তছে জপ
শূন্যতার মরুভূ প্রান্তরে,
বৈরাগ্যের জটিল অক্ষরে॥

শব্দব্রহ্ম

তুমি আর কোনো কথা শুনিতে পাবে না—
স্নেহ, প্রেম, করুণার নিগূঢ় বারতা
বিদীর্ণ এ পৃথিবীর বুকে কান পেতে,
সেখানে অদ্ভূত এক শব্দ সঙ্কুলতা।

কথা আছে, বোধ নেই, নেই বিশিষ্টতা—
রুদ্ধশ্বাস ভয়ঙ্কর শব্দের জটিলে,
আপাততঃ নিরুদ্দেশ ভয়াবহ ভিড়ে,
কথার হৃদয়গুলি পাবে না খুঁজিলে।

মিশাইল, রকেট ও এ্যাটম অক্ষরে—
নিদারুণ শব্দবৃত্তে গূঢ় সংযোজন—
পৃথিবীর সাম্প্রতিক সাঙ্কেতিক লিপি,
বুঝিবেনা তোমাদের প্রচলিত মন।

তোমাদের সুপ্রাচীন অমেয় সংলাপ—
মহৎ নির্দেশে-ভরা সহৃদয় রীতি—
ধূসরিত শিলালেখ পরম্পরা মতে
হৃতবোধ নিতান্তই মুমূর্ষু মিনতি।

তুমি আর কোনো কথা চেয়ো না শুনিতে—
তথাগত হৃদয়ের প্রাণময় বাণী,
ইদানীং প্রেতমন্ত্রে অন্তরিত তাহা
সুনিশ্চিত লোকান্তর লইয়াছে মানি।

এখন নতুন শব্দ সঙ্কলন তরে
চলিতেছে চারিদিকে দারুণ প্রস্তুতি;
এ্যাটমের কূটাক্ষরে আনিবার্য বোধে
রচিতেছে শব্দব্রহ্ম-চূড়ান্ত বিবৃতি॥

যাত্রী

এ-কোন পথিক পথ চলে মনে মনে
জনতা—অরণ্য পথে, নিঃসঙ্গ গহনে।
দু-পাশে মৃত্যুর প্রেত সাজায়ে পসরা—
বিচিত্র সম্ভার, মোম মৃত্তিকায় গড়া
রম্য পুত্তলিকা যত, পণ্য লক্ষ শত,—
ইঙ্গিত মুখর পথ, দীর্ঘ বিসর্পিত।
কামনা কুটিল পথে সরীসৃ[illegible]ক
এ কোন্ পথিক স্বপ্ন দিগন্তেরে আঁকে।
মনের বীক্ষণে জাগে স্বপ্নের মিছিল—
আলো, ছায়া, আরো আরো মৃত্যুর নিখিল
অন্তহীন যাত্রাপথ, স্তব্ধ বিস্মরণে
জটিল শাখার গ্রন্থি জনতার বনে।
সুদীর্ঘ দিবস আর রাত্রির অতলে
প্রার্থনা-কাতর মন পথ খুঁজে চলে।
তবু পথ খোঁজা এই জনতার ভিড়ে
মনে মনে দৃষ্টি মেলে সুদূরের নীড়ে।
মেলেনা পথের দিশা মনের যাত্রায়
তীর্থের পথিক এ কে, অশান্ত আত্মায়॥

অতৃপ্ত ইচ্ছা

ধূমায়িত অগ্নিশিখা আঁখি-দীপে জ্বলে,
মানস কটাহে এ কী লাভাস্রোত গলে!
কল্পলোকে দাবাগ্নির লেলিহান শিখা
তৃণ, পুষ্প, লতা, গুল্মে শুধু ভস্মলিখা।
মরুভূ প্রান্তর আর জ্বলন্ত অঙ্গারে
আবরিয়া জীবনের আজন্ম প্রসারে
রেখে যায় বহুদূর শুধু অগ্নিবাহ—
হুতাশন স্পৃষ্টদেহে আরক্ত প্রদাহ।
নিশিদিন সেই জ্বালা দূর কল্পলোকে
হু হু করে প্রাণান্তিক রক্তাক্ত আলোকে.
একটি মুকুল কিংবা ক্ষীণ কিশলয়
মানস উষর প্রান্তে পরম বিস্ময়,
একটি চন্দ্র কিংবা তারকার তরে
বিদগ্ধ আত্মার বুকে কত রক্ত ঝরে:
তবুও ছুটিছে আত্মা তৃষ্ণার্ত আগ্রহে
নিশিদিন ষ্ট্রম্বলির তপ্ত লাভা বয়ে,
দগ্ধ অঙ্গারের মাঝে খুঁজিছে বৈভবে
অস্থির আগ্রহে আর কী অতৃপ্ত লোভে।
লজ্জা ঘৃণা কিংবা কোন ব্যর্থতার ক্ষোভ
দমিতে পারেনি তার অশান্ত এ লোভ।
একটি করবী কিংবা তৃণ পুষ্প লাগি
উন্মত্ত সন্ধানে ফেরে শ্মশান বৈরাগী॥

মহাশূন্য

নাই নাই, আর কিছু নাই,
আছে শুধু মহাশূন্যটাই—
আকাশ বাতাস ছেয়ে
নিষ্পলক সাদা চোখে চেয়ে।
দৃষ্টি তার মনের সুদূরে
সন্ধানী নেশায় মরে ঘুরে,
সেখানেও কাল কাল ধোঁয়া
নিশীথের অন্ধকার ছোঁয়া।
দুস্তর সমুদ্র সবটাই
সেখানে বন্দর আর নাই।
তবু সেই দুস্তর সমুদ্র ব্যাপে
সুদূর হাওয়ায় ওঠে কেঁপে
প্রাণাতীত নিমেষের স্পর্শ টুকু শুধু,
আর বুঝি বাষ্প হয়ে ঝরে কিছু মধু।
দূর অতীতের বুঝি মধুচক্রটারে
প্রদক্ষিণ করে বারে বারে,
শুন্যতার মাঝে মাঝে করে যে রণন
কোন দূর ভাবনার ভ্রমর গুঞ্জন।
নিমেষেই মধু সব শেষ,—
অন্তহীন শুধু অবশেষ।
শুধু জাগে মহাশুন্যটাই
ভ্রমরের চিহ্ন কিছু নাই॥

ছায়া

ছায়া নামে সকালে সন্ধ্যায়,—
সামনের ফালি মাঠে,
ভিজে ঘাসে, কাঁচা আঙ্গিনায় ;
আধ ফোটা ফুল, ঝোড়ো পাখী
শ্যাওলা আকাশ,
সেখানেও ঝরে কী আভাস !
একই ছায়া বেলা অবেলায় ।
কোনো এক ফাগুন বেলার
অনেক পুরনো সেতো জানি—
প্রসরিত ছায়া কবে কার
অকস্মাৎ চোখে চোখে চায়
উঁকি দেয় খোলা জানালায় ।
ইতিহাস খুঁজে পাই বুঝি
স্বপ্ন পেরিয়ে এসে কবে --
ফালি মাঠে, খিড়কির ঘাটে
রাজপথে ছায়ার মেলায় ।
অনেক নতুন মুখ—
সে দিনের কত চেনা—
আশে পাশে এদিকে ওদিকে
প্রত্যহের ছায়াতে মেলায় ।
সে দিনের ছায়া আজও নামে
সামনের ফালি মাঠে আধফোটা ফুলে
ঝাপসা আকাশে আর
দখিনের খোলা জানালায় ॥

আর এক পৃথিবী

এই সব অন্ধকার হৃদয়ের ভিড়ে
ঠেলে ঠেলে দিও নাকো
যেতে দাও ফিরে।
ভিড় ঠেলে ঠেলে আজ জেনেছে হৃদয়
আর কোনো দৃশ্য নেই,
অন্ধকারে মুছে গেছে
সব পরিচয়।
যেতে দাও ফিরে,
অনেক হয়েছে খোঁজা অন্ধকারে ভিড়ে।
হয়েছে সময়,
ইতিহাসে লিখে নিতে নিরন্ধ্র এ পৃথিবীর
বিচিত্র অন্বয়।
আজ ফিরে যেতে দাও,
তোমাদের পৃথিবীর অপূর্ব বেসাতি
করে দিয়ে ইতি,
অন্য এক অন্বেষায় একান্ত উধাও।
সেই পথই খুঁজে নেবো—
যে পথে অনেক
ধূসর খড়ের মাঠ,
ধূলো বালি ঝোপ ঝাড়,
আগাছার হাট।
সে পথেই খুঁজে পাবো—

কুঁচিলা ধুতুরা আর
বিষকাঁটা যন্ত্রণার ক্ষতে
অবশ্যই কোনো এক কালাশুদ্ধি মতে।
সেখানেই একা একা
মেলে দিয়ে মন,
খুঁজে পাবো খুঁজে খুঁজে
হৃদয়ের বন।
সেখানেতে নেই থাক
টারম্যাক,
নিওন সাইন আর জ্বল জ্ব'লে পোষ্ট,
সানবাথ্ কোষ্ট;
সেখানেই আছে এক অপূর্ব পৃথিবী
আর অনন্ত আকাশ
পরম নিঃশ্বাস।
সেখানে পৃথিবী উমা, গৈরিক ভরণ,—
রুদ্রাক্ষের তিতিক্ষায়
সুনিশ্চিত খুঁজে পায়
তৃতীয় নয়ন॥

সমীক্ষণ

এর চেয়ে ভাল হতো ঘুমায়ে পড়িলে,
কিংবা ফিরে গেলে,
কোনো এক সুপ্রাচীন গুহার আঁধারে,—
মানুষের জন্মটাকে মানুষের মতো—
বাঘ, সিংহ, জেব্রা আর হরিণের মতো—
বুঝে নিলে
অরণ্য সংসারে।
এই আমি অকস্মাৎ জেনেছি সম্প্রতি
বিশেষতঃ হয়েছি অবাকও,
সে সংসারে বাঘেদেরও আছে ক্ষুন্নিবৃত্তি
হরিণেরা হরিণের মাংস খায়নাকো।
সে আশ্চর্য সংসারের পরম আস্বাদ
চেটে পুটে শেষ করে মাত্র ক'টা অযুত বছর
মেলেনি সন্তোষ,
পুনশ্চই অনিবার্য ক্ষুধায় কাতর।
তাই সব মিনারের শীর্ষচূড়ে প্রাসাদের অলিন্দে ও ছাদে
রাক্ষসের ক্ষুধা যত বিগতের প্রেত হয়ে কাঁদে,
বর্তমান প্রেতেদের মাংস খেতে চেয়ে।

অতএব এই বুঝে জাতক হৃদয়,
ভূতগ্রস্ত প্রাসাদের তালা ভেঙ্গে প্রাচীর ডিঙিয়ে
পেতে চায় অরণ্যের পথের নিশ্চয়,
মনে ভেবে একান্ত আশ্রয়,
খুঁজে পেলে হয় ভাল অরণ্যের অন্তরের কাছে।
পথে পথে পাহারা ও সান্ত্রীদের সুকঠোর
নিষেধ এড়িয়ে,
কখনো বা গিয়েছে সে,
কিন্তু দেখে চেয়ে,
ইতিমধ্যে তাহার সে ভূতগ্রস্ত লাশ
কোনো এক সুসজ্জিত মর্গে শুয়ে আছে॥

পূর্বাপর

এরা সব কে!
জানিলাম আজ এই নতুন প্রভাতে।
ইহাদের পরিচয়
আরতো নতুন নয়,
স্বচ্ছ হয়ে গেছে সব কালের নিরিখে।
মহম্মদ ঘোরি আর নাদিরের মতো
নব নব প্রভাতের সম্ভাবনা যত,
খুঁড়ে খুঁড়ে ক্ষত করে, বর্ষা ফলকে,
প্রত্যহের কীর্তিনাশা স্বজিয়াছে কত
এরাইতো।
এদের দুর্ধর্ষ যত অশ্বের ক্ষুরে
ধূলি উড়ে উড়ে,
বহুস্তর নীচে
অনেক নতুন সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে।
বিস্মৃতির অন্ধকার কবর প্রাঙ্গণে
অনন্য মনে
খুঁজে দেখো, সবকটা কবর চৌচির
ফেঁড়ে-ফুঁড়ে হয়েছে বাহির
নাদিরেরা—

বর্শা ঘাড়ে তরবারি হাতে
কল্পারম্ভ প্রাতে
বারংবার হানা দেয় সেই তা'রা।
অন্ধকার বুকে বয়ে সেই সব কবরের প্রেত
করিছে সঙ্কেত,
জাতক সূর্যের কণ্ঠ ক্রুদ্ধহাতে পিষে
নিঃক্ষত্রিয় করিতে নিঃশেষে
এই পৃথিবীকে।
এর পর আরো এক নিগূঢ় প্রার্থণা,
আরো এক জন্মের যন্ত্রণা,
রয়ে যাবে বাকী—
জানিয়াছি।
তাই আজ কবরের মরা-চোখে চেয়ে
হাতড়িয়ে খুঁজি,
পাইলাম বুঝি,
এই সব অচেনাকে॥

কবর মন

আমাদের কুটির প্রাঙ্গণে
অনন্য মনে
কারা যেন খুঁড়েছে কবর
সম্ভাবিত মৃতদের মুখ চেয়ে।
অথচ সে প্রত্যাশিত মৃতদের না-পেয়ে খবর
এই সব শব বাহকের দল ম্রিয়মান;
যেহেতু ইহারা সব উচ্চাশয় প্রাণ—
সুতরাং বিশিষ্ট কর্তব্য বুঝে
হয়েছে বাহির, যদি পায় খুঁজে
অন্ততঃ মুমূর্ষু ক'জন।
দু-একটা সন্ধ্যাতারা আর বুঝি শঙ্কিত টগর
চুপি চুপি করে কানাকানি,—
অতএব কলিগুলো ফোটাবার প্রয়োজন
নেই অতঃপর।
প্রাঙ্গণের দূর কোণে ছায়ার আড়ালে
আমলকী ডালে,
মা-বাবুই ভাবে মনে মনে,
বাসা বুনে ডিম পেড়ে, বাচ্চাদের
অবুঝ কূজন
ক্ষান্ত করা যথার্থই উচিত এখন,
যেহেতু এখানে চাই কবর নির্জন।

কেননা সে প্রোৎসাহিত খনকের দল,
সম্ভাবিত মৃতদের তরে
অনেক আকাঙ্ক্ষা ভরে
প্রাণের ভিতর,
খুঁড়ে গেছে অজস্র কবর।
এর পর কুটির প্রাঙ্গণ
মাঠের শ্যামল আর পলাশের বন
নিতান্তই নিরর্থক নিয়ম লঙ্ঘন।
আর এক সভ্যতার আশু জন্ম দিতে,
কুটিরের, প্রাসাদের অন্তঃস্তলে ভিতে
যারা সব খনিত্র বিঁধিছে
পরম উৎসাহে,
তাহাদের মিছে
উত্যক্ত করাতো নয় উচিত এখন।
তাহাদের বিবর্তন মন
আমাদের মুখের আদলে
অতিশয় সুকৌশলে
খুঁজে খুঁজে পেয়েছে দেখিতে,
সেই সব প্রত্যাসন্ন মৃতদের মুখ
যাদের আশায় বেঁধে বুক
খুঁড়িয়াছে অজস্র কবর॥

প্রাগৈতিহাসিক

জীবিত ও মৃত যত কঙ্কালের কথা—
সৃষ্টির অকাল হতে ভেসে—আসা কবেকার
সেই গুপ্তকথা,
পথক্লান্ত কোনো এক উদ্বাস্তু হৃদয়
অকস্মাৎ জেনেছে তা।
নাদিরের ক্ষুরধার
তলোয়ার
কেটেছে গর্দান যার,
আর যত নাচার সৈনিক,
ছন্নছাড়া নাগরিক,
তার
কান্নার,
উৎস খুঁজে খুঁজে কণ্টকিত ক্ষত-মন
সুনিশ্চিত বুঝেছে এখন,—
এর পরে পথ নাই—
মৃত্যুহীম উত্তুঙ্গ চড়াই,
পৃথিবীর কোনো এক সুপ্রাচীন ক্ষুধা
অন্তলান্ত মেলে আছে হাঁ;
শুধু এক আদিম গর্জন
আর লোভার্তের লালা প্রস্রবণ।
অতঃপর সবকিছু অন্যথায় বুঝে
উপল ব্যথিত পথে, পথ খুঁজে-খুঁজে,

অগত্যাই ফিরে আসা,
স্রোতে রেখে মন
ক্লান্ত পায়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে
হৃদয়ের বন,
ছিঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে সব অন্তিম প্রত্যাশা
আরো শেষে বুঝিয়াছে মন,
এর কোনো উৎস নেই
আরো নেই কোনো উত্তরণ,
অন্তহীন শুধুই প্লাবন।
কোনো এক অপহৃত
নাবিকের মতো
ছন্নছাড়া দ্বীপে মুখ গুঁজে
সুনিশ্চিত লইয়াছে বুঝে,
অতঃপর
গত্যন্তর,
খুঁজে দেখা পৃথিবীর
অন্তিম কবর॥

দরখাস্ত

এইবার
খুঁটিটার
দড়িগুলো খুলে দিতে পারো।
জাবরের কী-যে স্বাদ, গোয়ালের কী আশ্বাস
মূল্য জানা হয়ে গেছে তারও।
লাঙ্গলের ফাল টেনে টেনে
ফসলের ইতিহাস লইয়াছি জেনে;
তোমাদের অমোঘ নির্দেশে
এই বুঝে লইয়াছি শেষে,—
আলের সীমানা-বাঁধা পথে
চলিতেই হবে কোনো মতে
অবশ্যই নির্বিশেষে মেনে,
অতিক্রম অধিকার কোনোকালে
নেই কভু কারো।
মাটির অনেক নীচে বুকের গভীরে
ঘাম আর কান্না ঢেলে শিকড়ে শিকড়ে
নিবেদন করিয়াছি তোমাদের
চূড়ান্ত আদেশ,
আমার জাবর কিংবা গোয়ালের ভবিষ্যত
জানায়েছি আরো।

আমার নাচার মুখ চেয়ে
মাটির বুকের স্নেহ মাঠ খেত ছেয়ে
পড়িয়াছে ঝরে ;
অঘ্রাণে মাঠের ঘ্রাণ
হয়ত ছুঁয়েছে প্রাণ
কোনো এক অবুঝ সঙ্কেতে।
ফিরায়ে নিয়েছি মুখ
মিথ্যা বুঝে উদ্দীপন
পরম্পরা মতে।
সুতরাং সব কিছু আঁটি বেঁধে, গুণে গুণে
এক এক করে,
দুঃস্থ মনে প্রাচুর্যতা বয়ে,
নামায়েছি তোমাদের আঙ্গিনায় শেষে
ছুটির আশ্বাসে,
দিনান্তের বেদনার ফসলের ভারও।
পুরস্কার মাগিবার
জন্মসত্বে অধিকার
নেই এই জেনে,
জাবরের সব স্বাদ গোয়ালের নির্ভরতা
লইয়াছি মেনে।
এখন হৃদয় খড়,
মাঠের ধূসর
নামিয়াছে মনে,
সমস্তই পরিষ্কার
ধূ ধূ মাঠ সুবিস্তার
একটু সবুজ ছোঁয়া নিঃসন্দেহে নেই কোনো কোণে।

ঝরা-পড়া ক্ষয়-ক্ষতি নেই কোনোখানে,
এই বলে খতিয়ানে,
চূড়ান্ত লাভের অঙ্ক কষে নিতে পারো
আর খুঁটিটারও দড়িগুলো খুলে দিতে পারো।

প্রাজ্ঞ

আমাদের সব কথা বলা হয়ে গেছে;
কেহ কিছু শুনিয়াছে,
কেহ কিছু না-শোনার ভাণ করিয়াছে।
জন্ম হতে মৃত্যু পথে প্রত্যহের ক্লিষ্ট পরিক্রমা
আর তার যত সব বিপন্ন ভঙ্গিমা,
আড় চোখে ইহারাতো সব দেখিয়াছে
অথচ কী সুকৌশলে চোখ ফিরায়েছে।
ইহাদের স্থিতপ্রজ্ঞ তথাগত মন
আবশ্যিক মনে বুঝে অনন্ত শয়ন—
কিংবা কোনো কুম্ভকর্ণ ঘুমায়ে পড়েছে,
বাস্তবিক পারম্পর্যে শান্তি লভিয়াছে।
অধুনা পেচক রাত নিরন্ধ্র নিবিড়—
আহা নিদ্রাগত যত মহান্ত স্থবির!
আপাততঃ সংবেদন মিথ্যা বুঝিয়াছে
সমাধির নির্বিকারে মোক্ষ লভিয়াছে।
ইহাদের হিমকুণ্ঠ ভেকের হৃদয়
খুঁজে খুঁজে পাইয়াছে গুহার প্রশ্রয়।
উত্যক্ত করাতো নয় উচিত এখন
এই সব ভেকেদের সূর্যাতঙ্ক মন,

দিনের আলোকে মৃত্যু এই বুঝিয়াছে
নিরাপদ শশকের চক্ষু মুদিয়াছে।
এখনো আঁধার রাত গাঢ় অন্ধকার
মিথ্যা কোলাহলে এরা খুলিবেনা দ্বার,
নিশ্চিন্ত আঁধার কোণে ঘুমায়ে রয়েছে
জানেনাতে৷ আহা কোথা সূর্য উঠিয়াছে॥

অসুখ

দক্ষিণ বাতাসে শ্বাস টেনে নিতে পারিনাকো আর,
কী ভীষণ কষ্ট হয়। অথচ হাঁপানি নয়, বুকের বিকার
কিছু নেই, ওরা বলে। ফুস ফুস, হৃৎপিণ্ড সবই ঠিক ঠাক
চলছে, চলবে কিছুদিন-বেশ কিছুদিন, অথচ অবাক
কাণ্ড কী যে! গভীর অনিচ্ছা কেন দক্ষিণের জানালা খোলার ;
বিষাক্ত জীবাণু আছে, বিশ্বাস করে না কেউ—যথার্থই ক্লেশ হয়
কিছু ঘ্রাণ নিলে সে হাওয়ার।

নদী, ঢেউ, তীর—গাছের ওপরে বসে মাছরাঙা পাখি
বেতবনে অন্ধকারে আলো জ্বেলে অযুত জোনাকি
ঘোরে ফেরে। তারা ফোটে, চাঁদ ওঠে, থাকে নাকো আর
অন্ধকার—সমুজ্জ্বল সব নাকি, অথচ ব্যাপার
আশ্চর্য বড়! দৃশ্যমান কিছু নয়—চোখের অসুখ নাকি,
হয়তো বা ছানিই পড়েছে। দেখিয়েছি বিশেষজ্ঞ ডাকি,
কিছু নেই ওরা বলে-কোন রোগ, ছানিও কাটার
আশু প্রয়োজন নেই। অথচ আশ্চর্য একী! দু-চোখে হাতড়ে
কিছু পাইনে দেখার।

আরো আছে, আরো এক আশ্চর্য অসুখ, প্রতিকার
সাধ্যবহির্ভূত বুঝি! কান দুটো কোনো কিছু শব্দ শোনার
ক্ষমতা রাখে না আর। পাখিরা ডাকুক কিংবা বাজুক সেতার

আশে পাশে—কিছুই শোনে না সেতো। মমতায় ভালো বেশে
কেউ যদি বলেও কাউকে কিছু, কিংবা আমাকে,–সবই যায় ভেসে
আরো সব ভয়ঙ্কর শব্দের গভীরে যেন। মনে হয় চারিধার
শব্দগুলো করে মাতামাতি,–বাড়ি-ঘর, গির্জা আর মন্দির, বিহার
অনিবার্য ভেঙে চুরমার।

অথচ আশ্চর্য দেখ, পি, কে, বোস, নিতু রায়, অরিন্দম দে-র
যথাক্রমে বৌ—সিঁথির সিঁদুর-তোলা মিনি চাটুজ্যের
প্রোৎসাহিত মুখখানি অথচ সুস্পষ্ট দেখি, ভুরুটি আঁকার
বিশিষ্টতা তাও দেখি। দু-চোখে তাহার ভবিতব্যতার
ঢেউগুলো আকাঙ্খায় দোলে, সেও চোখে ধরা পড়ে
অতি পরিষ্কার।

আরো কী আশ্চর্য শোনো, ঘোষেদের বি, এ-পড়া ছোট মেয়েটার
ফিস ফিস কথাগুলো সতর্কিতে ছুঁড়ে-দেয়া গলির ওপার
মনে হয় সুবিন্যস্ত অতি। নদী, ঢেউ, বাতাস ছাপিয়ে
কথাগুলো শব্দে নাচে, সুরে সুরে শ্রুতিবোধ্য হয়ে,
অথচ অসুস্থ কী যে! গাছ, নদী, শব্দ ছেয়ে নিস্তব্ধ আঁধার,
আমাকে ঘিরেই নির্বিকার॥

আতশি কাঁচে জ্বলে

কেউ কেউ বলেছে আমাকে,—
ইদানীং মানুষের আত্মাগুলো জ্যোতিষ্কের প্রবুদ্ধ আলোকে
আরো নাকি দীপ্যমান। অবারিত কিলোওয়াটে
ওম পেয়ে উজ্জীবিত তা'রা সব পৃথিবীর পুরোন আঁধারে—
সুপ্রচেষ্ট অন্য আরো পৃথিবীতে হৃদয় ছড়িয়ে।
সুপ্রাচীন মাটির প্রদীপে,
জেনেছে স্তিমিত শিখা। অনেক জ্বালাতে চেয়ে মলিন প্রলেপে
অন্তিমের অন্ধকার ভবিতব্য বুঝে, নতুন শিখার মুখে
চক্‌মকি ঠুকে, আত্মাগুলো জ্বেলে জ্বেলে সানন্দ উৎসাহে,
পরস্পর মুখ দেখে আশ্চর্য প্রদীপে।
এ কথাও বলেছে অনেকে,—
কারো কারো আত্মা নাকি জ্যোতিষ্কের প্রতিবিম্বে থেকে
সমুজ্জ্বল হতে হতে আত্যয়িক তাপে গলে গিয়ে
কয়লা হয়েছে ; এবং সে ধূলি, ছাই, কয়লার স্তূপে
চাপা পড়ে, কারো কারো আত্মা নাকি ফের খোয়া গেছে॥

হানা বাড়ি

আমাদের সুবৃহৎ বনেদি বাড়িতে
সব কিছু ব্যবস্থিত বটে। পেতল, কাঁসা আর মাটির হাঁড়িতে
আকস্মিক স্পর্শদোষে যদিও বা জলতরঙ্গ বাজে,
প্রাসঙ্গিক সেটা, তা'রই কিছু সরস আওয়াজে
কেউ বা উৎকর্ণ কিছু, মন গাঁথে নতুন সিঁড়িতে।
তবু এই প্রাসাদের বিভিন্ন মহলে
নাচ, গান, মাইফেল—ঐতিহ্যের যথাবিধি সংকীর্তন রোলে
উঁচু নীচু শব্দগ্রাম। চেখে চেখে রঙীন তামাসা
সবাই আবিষ্ট অতি। হৃদয়ের বিশুষ্ক পিপাসা
আকণ্ঠ মিটিয়ে নিয়ে উদ্দীপিত আরো কৌতূহলে।
যদিও এ বাড়িটার আনাচে কানাচে
অন্ধকার স্বপ্রতিষ্ঠ,—অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনে বিম্বিত রয়েছে
ছায়াচ্ছন্ন ইতিহাস—হামেসাই গৃহে বারান্দায়
অশরীরী শব্দে কাঁদে,—সেটাও ধর্তব্য কিছু নয়,
গৃহস্থেরা নির্দ্বিধায় ভূতেদেরও স্বত্ব মেনে আছে।
ভূতেরাই কর্তৃপক্ষ বোধবুদ্ধি গুণে
ইদানীং যৌথ পরিবারে, তাহাদের পরামর্শ যথাযথ শুনে
আশ্বস্ত সবাই অতি। তাহাদের আশ্চর্য প্রজ্ঞায়
সংসারের কার্যক্রম সাবলীলই বটে বলা যায়—
সূক্ষ্মবোধ-বুদ্ধি বলে প্রত্যহের জাল বুনে বুনে।

সুপ্রাচীন এই গৃহে আরো বহুকাল
ঐতিহ্যের স্বত্ববোধে প্রলম্বিত ছায়াচ্ছন্ন অনেক কঙ্কাল
আবাসিকই রয়ে যাবে, ইহাদের ধূসর হৃদয়
পারম্পর্যে ক্রিয়মাণ ; এ গৃহের প্রবীন সত্তায়
প্রাক্তনের কূটবোধ অধুনাও অবশ্য উত্তাল ॥

হে পৃথিবী—

তোমাকে আমাকে শুধু ছুঁয়ে
সে কোন্ অনামী নদী
হৃদয়ের আঁকা-বাঁকা তটরেখা ধুয়ে
বয়েছিল কোনোদিন যদি—
কিছু কথা, কিছু গান, কিছু কলরব,
কবে শেষ দু-দিনের ধূ ধূ বালুচরে,
পায়নি সাগর স্বাদ, তাই কি নীরব
না-বোঝার কোনো অবসরে ?
এ মনে কেবলি তট, আঁকা ধূলিরেখা
চৈত্রের, শুধু ভাঙ্গাচোরা --
আকাশ ছেয়েছে কবে চাতকের পাখা,
চোখে জ্বলে পোড়ামাটি শুধু আগাগোড়া।
যে নদী উধাও কোন্ দূরে
হৃদয়ের সুগভীর খাতে—
সে নদীর স্মৃতি মর্মরে
হে পৃথিবী, রাত জাগি
তোমাতে আমাতে ॥

অন্ধকারের জানালা

অন্ধকারের নিরেট দেয়ালে একটা জানালা ছিল,
বেঁচে গেছি তাই—পচে যেতে যেতে হৃৎপিণ্ডটা
কিছুটা বাতাস নিল।
অন্ধকারের স্থির-নিশ্চয়ে প্রাণ
তবু প্রত্যয়ী, সচকিত কিছু জ্ঞান
পাথর দেয়ালে কূট অক্ষরে—হৃদয়ের সুঘ্রাণ
ওই জানালায় ছিল।
বেঁচে গেছি তাই ফাটা ফুসফুস ছুঁড়ে জানালার পার
কিছু মেরামতি শুদ্ধ বাতাসে আয়ুর অঙ্গীকার।
যৌগবোধেই জারিত অম্লজান
ফাটা ফুসফুসে—নাভিশ্বাসে রেখে টান
যদিও চেষ্টা খড়কুটো ধরে—কিছু-কিঞ্চিত প্রাণ
ওই জানালাটা দিল॥

মনের ধূসরে

ফাল্গুন কবে শেষ
চৈত্রও শেষ হলো বুঝি,
মৌমাছি, প্রজাপতি
সিক্ত কী-চোখে ফেরে খুঁজি।
রোদের ধারালো চোখ
প্রান্তরে আগুন ছড়ায়
বকুলের দিন শেষ
অগণন রিক্ত শাখায়;
সবুজের ভাঙ্গা-হাটে
ঝরা-পাতা—মৃত্যুর মেলা,
নিঃস্ব মাটির চোখে
অসহ কী বিক্ষোভ জ্বালা।
সময়ের ঢেউ গুণে
ঝরা-ফুল, মরা-পাতা দিয়ে,
হলো না ব্যথার শেষ
স্বপ্নের ছোঁয়া চোখে নিয়ে।
চৈত্রের কটা দিন—
কবেইতো শেষ হয়ে যাবে,
মনের ধূসরে ভাবি—
তারপরে কী হবে, কী হবে॥

ধূসর হেঁয়ালি

কী যে এলো মেলো !
গোছাতে গোছাতে আগোছালো।
ছড়িয়ে গড়িয়ে শুধু যায়,
ছত্রাকার পথের মেলায়।
ক্ষোভের মশাল চোখে জ্বেলে
সতর্কিত খর দৃষ্টি মেলে—
খুঁজে নিতে, মেলাতে মেলাতে
বেলা যায় দূর অবেলাতে।
সাজাবার আপ্রাণ প্রয়াসে
মরুতৃষ্ণিকা কী চোখে ভাসে !
খুঁটে নিতে, হিসেব মেলাতে—
গোঁজামিল আয়-ব্যয় খাতে।
পথে, পথে, ধূসর হেঁয়ালি
তবু খুঁজে ফেরে সে খেয়ালী,
শ্রান্ত মনে অধীর প্রার্থনা—
আরো কসে মুষ্টিবদ্ধ করে
জীবনের কণ্ঠ চেপে ধরে।
সাজাতে মেলাতে দৃঢ় পণ—
হৃদয়ের গূঢ় আলাপন,
কুড়োতে কুড়োতে পথ চলে,
শূন্য মণিকোঠা বুকে জ্বলে॥

ফসল

সেই কবে হয়েছিল ভুল—
ক্ষমাহীন মুহূর্তের ভুল—
ভিক্ষা চেয়েছিল কিছু ফুল,
গোটা-দুই গোলাপ বকুল।
সাক্ষ্য তার আজও উপহাসে
বালি-ঝরা প্রাচীরের পাশে
আধ-মরা গাছ, নাম বুঝি বসরা গোলাপ—
তারুণ্যের আতুর বিলাপ।
যে মাটি দিয়েছি তার ধূসর গোড়ায়
ভাঙ্গা-ইঁটে মেশানো খোলায়,
সেই মূলধনে-ভরা টবে
ভুল করে আশা যেন কবে
জীবনের পুষ্পিত লগনে
নিরন্তর আর্ত আবেদনে
করেছিল গোলাপের সাধ—
হৃদয়ের কৃপণ প্রসাদ।
বন্ধ্যা সেই মৃত্তিকার জীবাশ্ম অন্তরে
রসহীন শেকড়ে শেকড়ে
বুভুক্ষু পাশব লোভে করেছে লেহন
রক্তহীনা জরাক্তি যৌবন।

কাষ্ঠশুষ্ক শাখা দুটি মেলে
প্রাচীরের পুরোন ফাটলে
ভিক্ষা চেয়েছিল কিছু দক্ষিণ বাতাস
আর সবুজ আশ্বাস।
দেয়ালের ফাটলে ফোকরে
লোভাতুর দৃষ্টি আজও ঝরে,
এতটুক চাঁদ যদি পায়
বর্ণালী ছায়ায়।
পল্লবে শাখায় শুধু প্রবাহ বিক্ষোভ—
এক কণা শিশিরের লোভ,
সাক্ষ্য ওই দাক্ষিণ্যের আশা
কঠিন মাটির বুকে কণ্টকের বাসা—
রক্তহীন যৌবনের প্রাণান্তিক ভুল,
ভিক্ষা চেয়েছিল কিছু গোলাপ বকুল ॥

আকাঙ্খার রাতগুলি

অনেক বিবর্ণ আর বিষণ্ণ আকাশে
অগণ্য মুমূর্ষু চাঁদ কত গেছে ভেসে,
দিনে দিনে ক্ষয়ে, ক্ষয়ে
একেবারে শেষ হয়ে,
বিস্মৃত সমুদ্রে গেছে মিশে।

আর যত ম্লান-মুখ নিঃসঙ্গ তারারা
শূন্যতার গাঢ়-চোখে চেয়ে গেল মারা
কুয়াশার কাল বুক ফুঁড়ে
কবর নিয়েছে খুঁড়ে,
দু-চোখে চূড়ান্ত-চাওয়া হয়ে গেলে সারা

সেই সব নক্ষত্রেরা, হিম-রক্ত চাঁদ—
ছায়াচ্ছন্ন, রসহীন, বিকৃত-বিস্বাদ,
ভবিষ্যের মমি হয়ে
কল্পকাল গেল রয়ে,
পূর্ণ করে আগামীর ফসিলের খাদ।

অথচ সে তারাদেরই নবজন্ম আশে
আকাঙ্খার নীল রাত বার বার আসে,
নবজাতকের মায়া—
ফিকে আর নীল ছায়া,
প্রেত হয়ে ভবিতব্যবোধে উপহাসে।

মৃত্যুলীন কোনো চাঁদ রাহু অবসরে
শোকাহতা রাত্রির বুকের উপরে
কোনোকালে জাগিবেনা
দিতে যে সান্ত্বনা
আগামীর কোনোদিনও বারেকের তরে।

তবু সে অবোধ রাত শুধু ধ্যান করে,
দুর্বোধ আকুল ভাষে কী-যে মন্ত্র পড়ে,
দূর ইতিহাসে
হারাতে নিঃশেষে
অগণিত শিশু-চাঁদ তবু মনে পড়ে॥

বন্দর মন

অনেক বন্দর, ঘাট, উজিয়ে এসে
এ কোন বালুচরে ঠেকলো শেষে,
আমার ভাঙা-তরী,
ছিন্ন দড়াদড়ি,
উদাস আকাশ-চোখে ভাবছি বসে,
ভাঙ্গা এ তরী কবে উঠবে ভেসে।

নতুন হাওয়া কবে লাগবে পালে
নীলের জোয়ার ছুঁয়ে ভাঙ্গা এ হালে,
ঢেউয়ের মন্তরে
ভিড়বে বন্দরে,
ঝলমল ঘাটে-ঘাটে, সোনার শীষে
ফসল উছল তীর উঠবে হেসে।

অনেক স্রোতের গান যায় নি কানে
কান্না-আকুল নদী গুমরে প্রাণে,
দূরের আলো, ছায়া,
ছড়ায় কী-যে মায়া
উধাও তীর কোথা পায় না দিশে
স্মৃতির কুয়াসা-জালে রইলো মিশে।

অনেক গুণ টেনে বালুর দেশে
কাঁটার তীরে, তীরে, খুঁজবে কী সে,
সোনার ঘাট সিঁড়ি
এ মনে খুঁজে ফিরি,
ভাবনা-চোখে হাল ধরেছি কসে
নতুন জোয়ার কবে ভাবছি বসে॥

উপস্বত্ব

কোন্ স্মৃতি রেখে যাবো এ মর্ত জীবনে
আগামী কালের কোনো সুদূর স্মরণে—
জীবনের আয়ুশেষে ফেলে যাবো পিছু
আগামী কালের তরে মূল্যবান কিছু।
সমুখে পিছনে শুধু ধূ ধূ মরুরেখা
জীবনের পটে-আঁকা নিষ্ফলের লেখা ;
দু-হাতে হয়েছে জড়ো লজ্জা, ক্ষোভ, ঘৃণা
চক্রবৃদ্ধিহারে এই আয়ুটার দেনা।
ভিক্ষা, উঞ্ছবৃত্তি আর হিংসার মহিমা
গান গেয়ে গণ্ডী-টানা জীবনের সীমা,
দুঃখ, ব্যথা, অতৃপ্তির, বঞ্চনার খেদ—
সঞ্চয়ন করে রচা জীবনের বেদ—
অন্তঃশ্রাবী যন্ত্রণার অনন্ত কাহিনী
মর্তের সংগ্রহ যত—তা'রই সবখানি ?
এ মর্তের ধূলি পরে রক্তাক্ত হৃদয়—
খণ্ড, খণ্ড, বেদনার বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়—
হয়েছে যা, রয়েছে যা জীবনে জড়িয়ে,
রেখে যাবো তা'রই কিছু দু-হাতে ছড়িয়ে ?
এর বেশী মূল্য কিছু এ জীবন ভরে
সঞ্চয়ন করিনিতো ভবিষ্যের তরে ॥

ইচ্ছা

শ্রান্তি ক্লান্তির পথ মুছে দিয়ে যাবো
এই প্রতিশ্রুতি রেখে সজল-স্মরণ হতে
নিঃশব্দে হারাবো।
সব নেবো এঁকে
নতুন নিরিখে,
নতুন কোদাল
লাঙ্গলের ফাল,—
বন্ধ্যা মরুর কাছে প্রতিশ্রুতি, তাও চেয়ে নেবো।
সব কিছু আঁটি-বাঁধা ঝাড়া হলে শেষ,
আলোকিত দিনে
ইঁদুরের সিঁদ নেবো চিনে,
সতর্ক প্রহরী-মনে আগামীর নবান্ন সাজাবো।
কসে ধরে হাল
তুলে দেবো পাল
কোনো এক নক্ষত্রের দিকে চোখ রেখে,
নতুন বন্দর খুঁজে খুঁজে
দরদাম নেবো কষে-মেজে,
ধুলোপড়া দিন,
ঝেড়ে-মুছে নতুনের দামে বেচে দেবো।
সমস্তই হৃদয়ের নতুন আস্বাদ।
হেমন্তের নতুন প্রসাদ,
দু-হাতে কুড়িয়ে নিয়ে
বিলোতে বিলোতে,
সোনালী চিহ্নের পথ এঁকে দিয়ে যাবো॥

সূর্য ইচ্ছা

এই হৃদয়ের কঠিন ইচ্ছাগুলি
বন্ধবিহীন বুনো অশ্বের মত,
স্পর্দ্ধিত ক্ষুরে উড়ায়ে ঝঞ্ঝা ধূলি
ভেঙ্গে দিতে চায় নিষেধের বেড়া যত।

স্তব্ধ নিশীথে সমুদ্র ঝড় যেন
অতলান্তিক হৃদয়ের কূলে কূলে,
আচম্বিতেই বজ্র দামামা হেন
রোষ-হুঙ্কারে গর্জায় ফুলে ফুলে।

মিথ্যা-নীতির ব্যাখ্যারে যেতে ভুলে,
পরমমন্ত্র চুপি চুপি কয় কানে—
অনুশাসনের ফলক উপাড়ি তুলে
ফেলে দিতে মন দরিয়ার মাঝখানে।

শাসনতন্ত্রে মারণমন্ত্র জ্বালা
সহ্যের সীমা পার হয়ে গিয়ে কবে,
শুরু করে দেয় প্রতিহিংসার পালা,
মাতে কী হৃদয় ভাঙ্গনের উৎসবে।

পৃথিবীর বুকে নির্মম যত ক্ষত
মানুষের-আঁকা, নিদারুণ নখে-নখে,
কুটিল নাগের অন্ধ বিবর যত,
কঠিন ইচ্ছা প্রকাশি সূর্য্যালোকে॥

বিশল্যকরণী

মৃতাপত্যা সেই কিসা গোতমীর মত
আমার আত্মার শব কোলে করে
আমিও ঘুরেছি কত
অলৌকিক সরিষার খোঁজে, প্রত্যেকের ঘরে,
জনে জনে জিজ্ঞাসা করেছি অবিরত—
তোমাদের আত্মাগুলি বেঁচে-বর্তে কুশলে আছে তো ?
প্রত্যেকের প্রসাধনপ্লুত মুখগুলি
অকস্মাৎ বিবর্ণতা মেখে হয়েছে কুণ্ঠিত,
অসূর্যম্পশ্যার মত লজ্জামুখ করে
নতচোখে কুশল প্রশ্নের মুখে ঝরকা দিল তুলি—
বিবসন প্রশ্নে তারা স্বতঃই বিব্রত।
তাহাদের মৃতবৎসা-ম্লান বিভূতিতে
দেখেছি অনেক আত্মা বিশল্যকরণী আশা করে
শবাধারে সযতনে রয়েছে জারিত।
সিদ্ধসরিষার শেষ ভিক্ষাঝুলি পেতে
আমি যে ঘুরেছি কত
আমার আত্মার শব ধরে বুকের ভিতরে—
ইতিমধ্যে যদিও গলিত ॥

আবার জ্বলতে চেয়ে—

কত কিলোওয়াট বাতি জ্বালবে বল তো
তোমাদের আঁধার বিবরে ?
দীপান্বিত হতে হতে ওম পেয়ে আত্যয়িক জ্বরে
চির খেয়ে ফেটে গেছে কাঁচের ফানুসটা তো
সব মোম, তেল গেছে ঝরে।
এখনো কি সমাধানে হৃদয় নিরত
হাতড়িয়ে অন্ধকার ঘরে—
ছাই-পোড়া সলতেটা ইচ্ছার দেশলাই ধরে
জ্বলবে কি কাঠি ঠুকে, ঠাণ্ডায় মিইয়েছে সেতো,
কালি-ঝুলি জমেছে ভেতরে।
যদি নাই-জ্বলে তবে কি হবে জান তো
সে আঁধার ঘরে বাস করে—
আর মোটে ক'টাদিন হিম খেয়ে প্রৌঢ় পাঁজরে
ঠাণ্ডার ঘুণ ধরে হৃদয়ের মাংস হয়তো
কুরে কুরে শেষ হবে ঝরে।
তখন সে কত ওয়াটে কার মুখ দেখবে বল তো
খুঁজে খুঁজে ঠাণ্ডা কবরে—
সেখানেতে মুখ কোথা, মুখোসেরা
দলে দলে শুধু ভিড় করে॥

ত্রিশঙ্কু

ক'টাদিন কবিতায় সমর্পিত হয়ে
মরসুমী স্মৃতিকল্পে হৃদয় জড়িয়ে
হয়তো শান্তি পাবো ! সেই চরিতার্থতাই
কাঁটাতার, প্রাচীর কীলকে লটকিয়ে
আপাততঃ ঝুলতে ঝুলতে দোল খাই।
অকস্মাৎ ঘুর্ লেগে বিষ বিবমিষা—
অন্ত্রকে হাতড়ে কোনো কুটিল জিজ্ঞাসা
বুকে উঠে কবিতাকে দারুণ ঘুলিয়ে
কখন্ উৎকণ্ঠ করে। মরসুমী তৃষা
শান্তি খোঁজে চৈতন্যের আঙুল বুলিয়ে।
তবু সেই স্মৃতিসত্ত্বে ঘুর্ণি থেমে গেলে
কীলকে আটকে ফের প্রাচীর-দেয়ালে
মন রাখি। সমর্পণে দোল দিয়ে
প্রাচীর ডিঙবো ঠিকই মালীটা ঘুমলে
হুকুমদা-র সাংঘাতিক জিজ্ঞাসা এড়িয়ে।
তারপরে কতদিন হৃদয় ছড়িয়ে
পশ্‌মিনা কারুকার্যে শরীর জড়িয়ে
অনেক ঘুমবো আমি রোগ-দেহ মেলে,
ব্যথার শরীরটাকে আলোয় গড়িয়ে
সেরে যাবো কোনো এক সমর্থ বিকেলে ॥

নব বর্ষ

আর কী নতুন রূপে সাজিবে পৃথিবী!
ভেবে ভেবে খুন হলো আজ তাই
একালের কোনো এক অপহৃত কবি।
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গোটা এক সুদীর্ঘ বছর,
দুটো ঠ্যাং প্রায় ক্ষয়ে শেষ,
শ্বাস টেনে টেনে আর অগত্যাই গুণে, গুণে
অনিচ্ছুক আয়ুর নিমেষ।
চামড়া শুকিয়ে কবে হলো খড়-খড়ে
পুরোন মাটির আর ধূলির প্রলেপে
সারাদেহে উই ঢিবি উঠিয়াছে গড়ে।
অনেক বৈশাখী ঝড়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়ে গেছে বেশ,
অসীমান্ত মরু সয়ে আর জ্বলে-জ্বলে
কাশের মতোই সাদা হইয়াছে কেশ।
ঘাটের মরার মতো দুটো চোখ—
আরো যেন মিশরের মমি—
কবরের পথ খুঁজে, খুঁজে
দেহভরি হিম-ঘাম উঠিয়াছে জমি।
আসন্ন মৃত্যুর পথ অগত্যাই খোঁড়া পায়ে চলে
হৃদয়ের সব রক্ত ঠোঁট বেয়ে পড়িয়াছে গলে।

আর কোনো রঙ নেই, নেই তাপ,
শুধু এক ছাই-সাদা মেরুর তুহিন,
বরফের চোখে জাগে কোনো এক অন্ধকার
নিশ্চিত কফিন্।
সেই চোখে কী কাজল আঁকিবে রূপসী,
নীল ঠোঁট লাল হবে কোন রসে রসি।
ওই চুল আর কাল হবেনাতো—
কালের হলফ,
আলাদীন মরে গেছে—এই যুগে মিলিবেনা
কোনো এক আশ্চর্য কলপ।
বৃথা চেষ্টা রঙ-সাজে, মানুষের চোখগুলো
কবেই তো হয়েছে পাথর,—
তোমার বুকের তলে খুঁজে দেখো,
এরা সব গ্রানাইট, কয়লা কিংবা আরো
সুপ্রাচীন ফসিল নিথর ॥

মাংস ভাগ

'লুনা-৯' (রুশ রকেটের) চন্দ্রে অবতরণ উপলক্ষে—

চাঁদের আসন্ন মৃত্যু, এই কথা সুনিশ্চিত জানি
নাড়ি ধরে বসিয়াছে যত সব শরীরবিজ্ঞানী
কঠিন কবিদ ;
মনে ভেবে এই চাঁদ অবশ্যই সুস্বাদু মাংসল,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়াছে ডানা মেলে
শকুনির দল,
চোখে নাই নিদ্।
মনের তীক্ষ্ণ নখে আরো কিছু দিতে বাকী শান—
হতভাগা এ চাঁদের উঠিয়াছে নাভিশ্বাস টান।
সুনিশ্চিত হইয়াছে স্থির,
ছিঁড়ে-খুঁড়ে নিতে হবে, ভাগা দিতে, হলে শেষ
ময়না তদ্বির।
অযথা আকাশ-জুড়ে বসে আছে এই চাঁদ—
অকর্মণ্য মহাঘৃণ্য প্রাণী—
সুতীক্ষ্ণ নখর অগ্রে অবশ্য কর্তব্য দেয়া
মৃত্যুচ্ছেদ টানি।
মানুষের ইতিহাসে এ চাঁদের নেই কোনো
মঙ্গল ইঙ্গিত,
ছন্নছাড়া করিয়াছে মানুষের অনেক অতীত,
শুধু বিড়ম্বিত।

মূল্যহীন ধূর্ত এক আলেয়া মায়ায়
ঠেলিয়াছে শুধু তারে অন্তিম ছায়ায়।
অভাগার মনের মুকুরে
রাত্রে দুপুরে,
ফেলিয়াছে অবোধ্য কী রামধনু ছায়া
শত রঙে চিত্র করি অনিবার্য মারাত্মক মায়া।
মানুষের পৃথিবীতে এ চাঁদের নেই কোনো কাজ,
অতএব অবিলম্বে আজ
উপাড়িয়া এই চাঁদ ব্যবচ্ছেদ করাই উচিত—
ছিঁড়ে ফেলে সাজ,
স্পষ্ট করা হয় ভাল অবোধ্য অতীত।
এই পৃথিবীর বুকে স্থান কোথা সশস্ত্র হানার
মেদ, মাংস খামচিয়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে
কবেইতো হয়েছে কাবার।
শুধু শুষ্ক হাড় দিয়ে চলিবে না
দরবারী ভোজ,
অতএব নিতে হবে খোঁজ,
এ চাঁদের দেহ ছিঁড়ে মিটিবে কি ক্ষোভ
চলিবে কি ভবিষ্যত সভ্যতার ক'টা দিন মহামহোৎসব ॥

রবীন্দ্রনাথ

তোমার আশ্চর্য আলো আমার শরীরে।
বৈশাখের সুনির্জন আকাশ নিবিড়ে
উদাসী একান্ত ছিল যে আলোর ঘ্রাণ পায়
বুকের গভীরে,
সেই আলো আমার শরীরে।
দুপুর ফুরিয়ে গেলে হেমন্তের নরম বিকেলে
তোমার যে আলোটুকু বলাকা মেখেছে
পাখা মেলে,
সেই আলো আমার শরীরে।
সকালের ভিজে ঘাসে, স্ফটিকের ছোট্ট মুকুরে,
অথবা পুরোন সেই বাড়িটার খিড়কি পুকুরে—
যে আলো ছায়ায় কাঁপে ছাতিম তলার
বেদী ঘিরে,
সেই আলো আমার শরীরে।
ভুবনডাঙার মাঠে, পদ্মার দূরান্তর চরে
কিংবা কোনো পারাবত-ভীরু-নষ্ট নীড়ে,
যে আলোর মায়াটুকু ঝরে ধীরে ধীরে,
সেই আলো আমার শরীরে।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকে,
যে আলোয় মেঘেজলে জলছবি আঁকে,
ঝরে পড়ে দেওদার চেনারের শিরে,
সেই আলো আমার শরীরে।
সেই আলো চোখে মুখে হৃদয়ে মেখেছি—
মানুষ-কীটের আহা হৃদয় দেখেছি!
সে আলোর নেশাটুকু বুকে ভরে নিয়ে
ছকু খানসামার লেন চলেছি খুঁড়িয়ে,
ভিড় ঠেলে ঠেলে আহা আরো এক ভিড়ে
তোমার আশ্চর্য আলো আমার শরীরে॥

দুই তীরে মন রেখে

নোঙর-ছেঁড়া এই নায়ে
উদাসে বসে বসে ভাবি—
ঘর বেঁধেছিল কোন্ গাঁয়ে
সেথা কি ফুরাল সব দাবী।

দু-তীর অনেক দূরে সরে,
ভাটির টানেই ভেসে চলি
এ পারে কেবলি মাটি ঝরে
ওপারে নরম কাঁচা পলি।

বাঁধন-ছেঁড়া এই নায়ে
স্রোতের ডাক শুনি বসে
ছায়া যে নামে পায়ে পায়ে
তীরের মাটি যায় ধসে।

সাগর কোথা কোন্ বাঁকে
কেবলি ঘোলাজল কাটে,
তীরেরা বাহু মেলে ডাকে
নতুন নোঙর কোন্ ঘাটে॥

যোদ্ধার মৃত্যু

সাভারকর,
এখনও আঁধার ঝড়,
অরণ্যের ঢের পথ বাকী,
সঙ্গীরা ফিরেছে ভয়ে—
পান্থ তুমি অগত্যা একাকী।
সম্মুখে শ্বাপদ-রাত
কালপেঁচা অমঙ্গল ডাকে,
মাংসলোভী বুভুক্ষুরা
ঝোপে-ঝাড়ে ওত পেতে থাকে।
দধীচি-হৃদয় মেলে
এ অরণ্য পার হয়ে যেতে,
সঙ্গীদের ডেকেছিলে
ভয়শূন্য দ্বিধাহীন চিতে।
ভরসা পায় নি তা'রা
ফিরে গেছে সঙ্কোচের কোণে,
অসংখ্য অরণ্য-প্রেত এঁকে নিয়ে
মৃত্যাতঙ্ক মনে।
একা তুমি চলে গেলে
পার হয়ে বন ভয়ঙ্কর,
পশ্চাতে রহিল পড়ে
শ্বাপদেরা, অসংখ্য বিবর॥

তা'রা বলে গেছে

কাশ্মীরের ময়দানে গোলাপের মেলা,
শহীদের দেহ ঘিরে তা'রা করে খেলা ;
শিয়রে ওরাই জাগে, আকাশের দূরে
গান গেয়ে অচেনা কী পাখি যায় উড়ে—
গোলা ছুটে টুটে যায় স্বপ্নের বেলা।

আমরা ফুরিয়ে গেছি ক'টা দিন আগে
পৃথিবীর খেলা খেলে অস্তারুণ রাগে,
ভালোবেসে আরো কত ভালোবাসা নিয়ে,
কাশ্মীরের ময়দানে গিয়েছি হারিয়ে—
সাক্ষী এই গোলাপেরা আর ক'টা ঢেলা।

দুশমনে চিনে নাও এ ধূসর চোখে,
আমার মশাল ধর, তাহারি আলোকে
বিজয়ের পথ নাও সুনিশ্চিত চিনে,—
তোমার শপথ আর প্রতিশ্রুতি বিনে
কাশ্মীরের ময়দানে আসিবেনা ঘুম
সারা রাত গোলাপেরা করিলেও খেলা॥